গ্রন্থের নাম: চালচিত্রের খুঁটিনাটি ॥ লেখক: হাসান আজিজুল হক

প্রথম প্রকাশ- নভেম্বর ১৯৮৬
প্রকাশক - চিত্তরঞ্জন সাহা

সাধন সরকার

সাধন সরকার মোটা কাপড়ের আধময়লা পাজামা-পাঞ্জাবি পরা, চোখে ভারি ফ্রেমের কালো চশমা—মানুষটি মাথা নিচু করে হেঁটে যাচ্ছেন। রাস্তা থেকে সহজে চোখ তোলেন না। মুখখানি গম্ভীর, ভারি। একমাথা কোঁকড়া চুল, এখন তার তিন ভাগই ধূসর হয়ে এসেছে। একটু যেন এলোমেলো, পরিচ্ছদ অবিন্যস্ত। তাঁর মধ্যে কোথাও নিজেকে গুছিয়ে তোলার ব্যাপার নেই।

একটু আগে বলেছি, মুখখানি গম্ভীর। কিন্তু পরিচিত কারো সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে ভরাট মুখে আরও ভরাট একমুখ সরল হাসি উপচে পড়ল, শোনা গেল আশ্চর্য জোরাল ভারি অথচ তীক্ষ্ণ উচ্চ-কণ্ঠের সম্ভাষণ, এই যে, কি ব্যাপার।

বুদ্ধির দীপ্তিতে ঝিকিয়ে উঠল চোখ দুটি। সাধন সরকারের বুদ্ধি-ধী আর মেধা, কৌতুক আর বিদ্রূপের একটা বিচিত্র মিশেল।

সাধন সরকারকে দেখা যায় তাঁর মির্জাপুরের পুরোন একতলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছেন, হাঁটছেন শামসুর রহমান রোড ধরে, খুলনা শহরের ছোট বড় রাস্তায়। বয়েস অনেক হলো তাঁর, ঠিক কতো হয়েছে জানি না, তবে পঞ্চাশের উপরে বলেই আন্দাজ করি।

এই দীর্ঘকাল কাটালেন নিজেদের পৈত্রিক একতলা বাড়িটায় স্ত্রী, পুত্র আর বৃদ্ধা মায়ের সঙ্গে। কখনো বাসনা করেননি বাইরে যেতে, নাম যশ অর্থ খ্যাতি প্রতিষ্ঠার কামনা এতটুকু টলাতে পারেনি তাঁকে তাঁর নিজস্ব জীবন বিশ্বাসের মাটি থেকে। সে জীবন বিশ্বাস যেন উদ্ভিদের। মাটিতে থাকতে হবে শিকড় ছড়িয়ে—চঞ্চল হয়ে ছুটোছুটি করে হাঁফাতে হাঁফাতে মৃত্যুর দিকে এগোবার দরকার কি? শুনেছি, পৃথিবীখ্যাত দার্শনিক কান্ট তাঁর জন্ম শহর কোনিগস্‌বার্গ থেকে

দশ মাইলের বাইরে যাননি তাঁর আশি বছরের লম্বা জীবনে। সাধন সরকার সম্বন্ধে সে কথা বলা যাবে না হয়ত, কিন্তু তাঁর মত একান্তই খুলনা শহরের মানুষ আর কেউ আছেন কিনা আমি জানি না। তাঁর একতলা বাড়িটিতে প্লাস্টার নেই, লোনা ধরে দেয়ালগুলো নড়বড়ে হয়ে এসেছে। কোথাও কোন বৃদ্ধির লক্ষণ নেই। সবটাই ক্ষয়, ভেঙে পড়ছে, ধসে পড়ছে, খুলে পড়ছে, সাধন সরকার দেখছেন। কি অসাধারণ নির্বেদ তাঁর। একি শুধু উচ্চাকাঙ্ক্ষাহীন, নিরুদ্যম বৈষয়িক বিফলতায় ভেঙে পড়া মানুষের অসহায় নিশ্চেষ্টতা, নাকি সাধন সরকারের প্রকৃতির মধ্যেই আছে নিরাসক্তি, নিস্পৃহতা আর নির্বেদ? জানি না।

প্রায় তিরিশ বছর পিছিয়ে যেতে হবে আমাকে। ১৯৫৪ সালে ষোলো বছরের ছোকরা আমি। এসেছি দৌলতপুরে বর্ধমান জেলার এক অজ পাড়াগাঁ থেকে। দৌলতপুর ব্রজলাল কলেজে ভর্তি হবার দুতিন মাসের মধ্যেই হবে, শোনা গেল সন্ধের দিকে একটি গানের আসর বসবে একজন অধ্যাপকের বাড়ির ছাদে। অধ্যাপকের নাম যতদূর মনে পড়ছে নীলরতন সেন। তিনি আমাদের বাংলা পড়াতেন। অসাধারণ শিক্ষক, থাকতেন এখানকার দৌলতপুর বাসস্ট্যান্ডের কাছে একটি লাল বাড়িতে। ঐ বাড়ির ছাদে ১৯৫৪ সালের কোনো এক পূর্ণিমা সন্ধায় সাধন সরকারকে প্রথম দেখি আমি। তখন তিনি তরুণ, পাজামার সঙ্গে লম্বা ঝুলের ফুলশার্ট পরেছেন। হাতার বোতাম লাগানো নেই। ওই বয়সেও বেশবাসে একটু এলোমেলো। মাথাভর্তি কোঁকড়ান কালো চুল কোনরকমে ব্যাক ব্রাশ করা। আসরের শ্রোতাদের অধিকাংশই অধ্যাপক, কে কে ছিলেন এখন আর মনে নেই, সবাইকে চিনতামও না। তবে অসাধারণ সঙ্গীতজ্ঞ, সমঝদার, গণিতের অধ্যাপক শ্রীসুবোধ মজুমদার ঐ আসরে উপস্থিত ছিলেন আমার মনে আছে। আসরের প্রথম দিকেই সঙ্গীতশিক্ষক কালিদাস চট্টোপাধ্যায় সাধন সরকারকে গাইতে বললেন। একটুও দ্বিধা না করে হারমোনিয়াম টেনে নিয়ে সাধন সরকার গাইলেন রবীন্দ্রসঙ্গীত—আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে। সেটা শেষ হতে শুরু করলেন—আমারে বাঁধিব

তোরা, সেই বাঁধন কি তোদের আছে। এই দ্বিতীয় গানটির কথা আমি জীবনে আর কোনোদিন ভুলতে পারবো না। রবীন্দ্রনাথের একটি গানে আছে, মনে রেখো আমি যে গান গেয়েছিলেম, মনে রেখো। মনের মধ্যে আমি এখন বারবার বলি, আমি যে গান শুনেছিলাম, মনে রেখো। আমাকে চিরকাল মনে রাখতে হবে, আমি গান শুনেছিলাম, আমি সাধন সরকারের গান শুনেছিলাম। কেমন ছিল তাঁর কণ্ঠ, কেমন ছিল তাঁর গাইবার ভঙ্গি, কি রকম নিখুঁত ছিল তাঁর গান—সেসব বিচার তো করাই যায়। যে সব বাঘা বাঘা সমঝদার সেদিন ওখানে ছিলেন তাঁদের হিসেব নিকেশ, আঁক-জোঁক, ব্যাকরণের নিয়মকানুনে কত না ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরা পড়েছিল। কিন্তু তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আমি এখনও দেখতে পাই কোঁকড়া চুলে-ভরা মাথা, ছিপ-ছিপে সাধন সরকারকে আর শুনতে পাই একটি ভরাট মধুর ভাব-সৌকুমার্যে ভরা অপরূপ কণ্ঠ, আমারে বাঁধবি তোরা সেই বাঁধন কি তোদের আছে।

দূর হোক এই ব্যক্তিগত ভাব-প্রবণতা। সাধন সরকার এখন গান গাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। শুনতে পাই তাঁর বাজার নেই।

এর অনেকদিন পরে ষাটের দশকের গোড়ায় কালিদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিজের তৈরি নতুন বাড়িতে গিয়েছি। তিনি একথা সে-কথার পর বললেন, সাধন আজকাল ভালো গাইছে। খুব ভালো গাইছে। আমি জিজ্ঞেস করি, কি গান উনি ? কালিদাস বাবু বললেন, উচ্চাঙ্গই গায়। একদিন গিয়ে শুনো। আমার কাছে তো আসে না আর। একটু চুপ করে থেকে কালিদাস বাবু আবার বললেন, লোন করে বাড়ি করেছি, এখন লোন শোধ দিতেই বাড়ি বিক্রি করতে হচ্ছে। বিক্রি ঠিক হয়ে গেছে। থাকবেন কোথায় ? ক্লিষ্ট হাসলেন তিনি, কোনো উত্তর দিলেন না আমার প্রশ্নের। বললেন অন্য কথা, সাধনের গান শুনে দেখো।

এই পর্যন্ত তো এরকম করে লেখা গেলো। যে মানুষের সঙ্গে কোনদিন পরিচয় হয়নি, মুখোমুখি আলাপ হয়নি একবারও, শুধু কখনো দেখেছি হেঁটে যাচ্ছেন, কিংবা কোনো আসরে গান গাইছেন,

তেমন মানুষ সম্বন্ধে দুচার কথা লিখে ফেলা আদৌ কঠিন নয়। এই লেখাটা এতোক্ষণ তেমনিভাবেই চলছিলো। বলতে কি ১৯৬৩ সালের আগে সাধন সরকারের সঙ্গে একটিও বাক্যবিনিময় হয়নি আমার। ১৯৬৩ সালের মার্চ মাসে অধ্যাপনার চাকরি নিয়ে আমি স্থায়ী-ভাবে চলে এলাম খুলনায়। আর তখন থেকেই সূত্রপাত হলো এক জীবন্ত যোগাযোগের—এক আশ্চর্য নিরবচ্ছিন্ন দীর্ঘ যোগাযোগ ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত। ভালোবাসায় শ্রদ্ধায় সহযোগিতায়, কর্মে ভাবনায় চিন্তায়, সহমর্মিতায় বিরোধিতায় তর্কে-বিতর্কে ফেনিল পরিপূর্ণ এই যোগাযোগ। যিনি ছিলেন দূরের মানুষ, তিনি যেন আছড়ে পড়লেন আমার দৈনন্দিন জীবনের ডাঙায়। সাধন সরকারের সঙ্গে এই দীর্ঘ সম্পর্ক কষ্টে-দুঃখে বেদনায় পরিণত হয়েছিল একটি নেশায়। সেই নেশায় আমি বুঁদ হয়েছিলাম দীর্ঘ দশটি বছর। কিন্তু শুধুমাত্র সে কথা বলার জন্যেই তো এই লেখাটা শুরু করিনি।

বাস্তবিক ১৯৬৩ সালের মাঝামাঝিতে আমাদের একটি অদ্ভুত পরিবার গড়ে ওঠে। তার নাম সন্দীপন। আমি জানি একটি সংগঠনকে পরিবার বলা অনুচিত—বিশেষ করে সন্দীপনের মতো একটা সাংস্কৃতিক সংগঠন যার কাজের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক বেশি দূরের ছিলো না, যার কর্মধারা বিষয়ে সংগ্রাম শব্দটার ব্যবহার অসঙ্গত নয় এবং যার ভূমিকা দেশ ও কালের পটে ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠছিলো। তবু এই সংগঠনের একটি পারিবারিক চেহারা ছিলো—সংগঠনগত নৈর্ব্যক্তিক কাজ আর কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক এমন একটা পর্যায়ে পেঁাছেছিলো যেখান থেকে সন্দীপনকে একটি পরিবার হিসেবেও দেখা চলতো। খুলনা এসে নাজিম মাহমুদ এবং মুস্তাফিজুর রহমানের সঙ্গে (মুস্তাফিজুর রহমান, সকলের মিত্র মুস্তাফিজ এই সেদিন চিরবিদায় নিয়েছেন তাদের শোকস্তম্ভিত করে দিয়ে) আমার যোগাযোগ হতে দেরি হয় না আর উৎসাহে উদ্দীপনায় সর্বক্ষণ যিনি টগবগ করে ফুটতে থাকেন, সেই নাজিম মাহমুদের মাথায় তখন একটা নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ার স্বপ্ন। সন্দীপনের জন্ম হলো। ওঁরাই আমাকে নিয়ে গেলেন সেখানে। গিয়ে দেখি

সাধন সরকার যার সঙ্গে আমার কখনো কথা হয়নি, পরিচয় হয়নি, প্রথম যৌবনে পূর্ণিমার আকাশ ভরা আলোয় যাঁকে আমার কিন্নর-লোকের বাশিন্দা মনে হয়েছিলো, দেখি তিনি বসে আছেন একেবারে সহজ মানুষ। একটু যেন বেশি সহজ, বড্ড বেশি স্বাভাবিক, আমার মধ্যে বিভ্রমের নেশা মাত্র থাকতে দিলেন না তিনি। বোধহয় কেউ আলাপ করিয়ে দিলেন না, আমিও একবার বললাম না, তাঁকে আমি আগে দেখেছি। আমরা কথা বলতে লাগলাম যেন চিরকাল কথা বলে এসেছি আমরা।

সেই শুরু। সন্দীপনের ভিতরে আমাদের সকলের মধ্যে একটা সম্বন্ধ গড়ে উঠলো। এই সম্বন্ধ এমনিই সহজ স্বচ্ছন্দ ছিলো যে, আমরা সকলেই নিজের নিজের ভাগে-পড়া কাজ করতে করতে পর-স্পরকে যেন লক্ষই করতাম না। স্ত্রী ডাকসাইটে সুন্দরী হলে স্বামী একদিন সেটা আর খেয়াল করতে পারে না, কদর্যকুৎসিৎ হলেও তো মনে থাকে না। জীবনের চাপে আমরা পরস্পরকে গ্রহণ করি, প্রশ্ন করি না। প্রশ্ন করতে গেলে দূরত্বের প্রয়োজন হয়। সন্দীপের ভিতরে আমরা কাজ করেছি, কে কতো বড়ো, ভাববার কোনো অছিলা পর্যন্ত ছিল না, সন্দীপনের কর্মপ্রবাহ সমসাময়িক রাজনীতির ঘূর্ণিাবর্তের মধ্যে পড়ে প্রচণ্ড গতিবেগ পেলো। আমাদের সবাইকে এক হয়ে দুর্ভেদ্য দেয়ালের মতো রুখে দাঁড়াতে হলো। সন্দীপনের মধ্যে এসে পড়লেন অসামান্য কর্মীপুরুষ খালেদ রশীদ। সকলেরই মনে পড়বে ষাটের দশকে একদিকে শোষণ তীব্র হয়ে উঠছে, অন্যদিকে গণতান্ত্রিক অধিকারগুলিকে একটির পর একটি ছিনিয়ে নিয়ে জেঁকে বসছে নিষ্ঠুর স্বৈরতন্ত্র। ভাষার প্রশ্ন, জাতিস্বারূপ্যের প্রশ্ন, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রশ্নে বিভ্রান্তিসৃষ্টির ষড়যন্ত্র নিরামিষ রাস্তা ছেড়ে ক্রমেই আমিষসন্ধানী হয়ে উঠছে। এই রকম প্রেক্ষাপটে সন্দীপন কাজ করছে, প্রতিষ্ঠানটিই গান রচনা করছে, সুরারোপ করছে, শিল্পী তৈরি করছে। তখন মনে থাকতো না গানগুলির প্রায় সবই রচনা করছেন নাজিম মাহমুদ, আবুবকর সিদ্দিক বা গানগুলিতে প্রায় এককভাবে সুরারোপ করছেন সাধন সরকার। সমস্তটাই সন্দীপনের

বিশাল কর্মযজ্ঞের অন্তর্ভুক্ত, ব্যক্তি গেছেন চোখের আড়ালে। কিন্তু সেই উন্মাদনা তো আর নেই। এখন পড়ে আছে ছাই আর বিষণ্ন ঠাণ্ডা পোড়া কাঠ-কয়লা। মনের ভিতরে চেয়ে দেখি, সেখানে জাড্য আর জড়তা শক্ত হিম হয়ে আছে। পিছন ফিরে আজ সাধন সরকারকে আলাদা করে চিনে নেয়া যায়। তখন দেখা যায়, কি অসাধারণ সাঙ্গীতিক প্রতিভা নিজেকে হাউইয়ের মতো জ্বালিয়ে ঊর্ধ্ব আকাশে উঠেছিলো। এখন দেখতে পাচ্ছি, সাত বছরে সাধন সরকার যে অসংখ্য গানে সুর দিয়েছিলেন তাতে আগুন ছিলো, মায়ের ভালোবাসা ছিলো, প্রেম বেদনার করুণ মূর্চ্ছনা ছিলো, জীবনের সংগ্রাম ছিলো, কিংবা এ সবই হয়তো বাজারচলিত কথা—সাধন সরকারের গানে ছিলো এই বাংলাদেশের মানুষের জীবনের বিচিত্র ছন্দ। আধুনিক গান এখন পণ্য, সবচেয়ে নিম্নরুচির সন্তোষবিধান ও বিনোদনের জন্যে রচিত সুরারোপিত ও গীত। সেখানে সাধন সরকার গান বলতে বোঝেন জীবন—জীবনের সব প্রয়োজনের সাথী। তাই সাধন সরকারের গল্যামার থাকবে না আশ্চর্য কি ?

আমার কথা ছেড়ে দিচ্ছি। সঙ্গীতের আমি কিছুই বুঝি না। সাধন সরকার কতো বড়ো শিল্পী তার পরিমাপ করা আমার সাধ্য নয়—তিনি কতো বড়ো সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ ও সঙ্গীতস্রষ্টা তাও আমি জানি না। কিন্তু আমি তাঁর সম্বন্ধে যা বুঝেছি, বিনয় বাহুল্যে তাঁর উল্লেখ না করাটাও কোনো কাজের কথা নয়। আমার কাছে তিনি একজন প্রতিভাধর সুরস্রষ্টা ও অতুলনীয় কণ্ঠসম্পদের অধিকারী শিল্পী। আমি জানি, গায়ক হিসেবে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে তিনি কখনোই উঠতে পারেননি, সুরস্রষ্টা হিসেবে তিনি তেমন কোনো স্বীকৃতি লাভ করেননি। প্রতিভাশালী মফস্বলবাসী শিল্পী বলে তিনি কখনো কখনো করুণা লাভ করেছেন মাত্র। বরাবরের নির্জন নিঃসঙ্গ সাধন সরকার পেয়েছেন অনাদর, অবহেলা, নিষ্ঠুর নির্যাতন ও অবজ্ঞা। দারিদ্র্যকীট সমস্ত জীবন ধরে তাঁর বৃহৎ পরিবারে ঢুকে কুরে কুরে খেয়েছে তাঁর বাড়ি তাঁর আসবাব ; তাঁর আপনজনদের নিঃশব্দে কেটে গেছে।

তীব্র অভিমানী, সম্পূর্ণ সৎ, স্বাতন্ত্র্যসন্ধানী ঠোঁট-কাটা আপসহীন সাধন সরকার সমস্ত সর্বনাশ প্রত্যক্ষ করেছেন।

আজ আমি এই নির্লোভ চরিত্রবান মানুষটিকে তাঁর নিষ্ঠার জন্যে, তাঁর সততার জন্যে, দেশের সঙ্গীত ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁর অসাধারণ বলিষ্ঠ ভূমিকার জন্যে নিঃশব্দেই শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

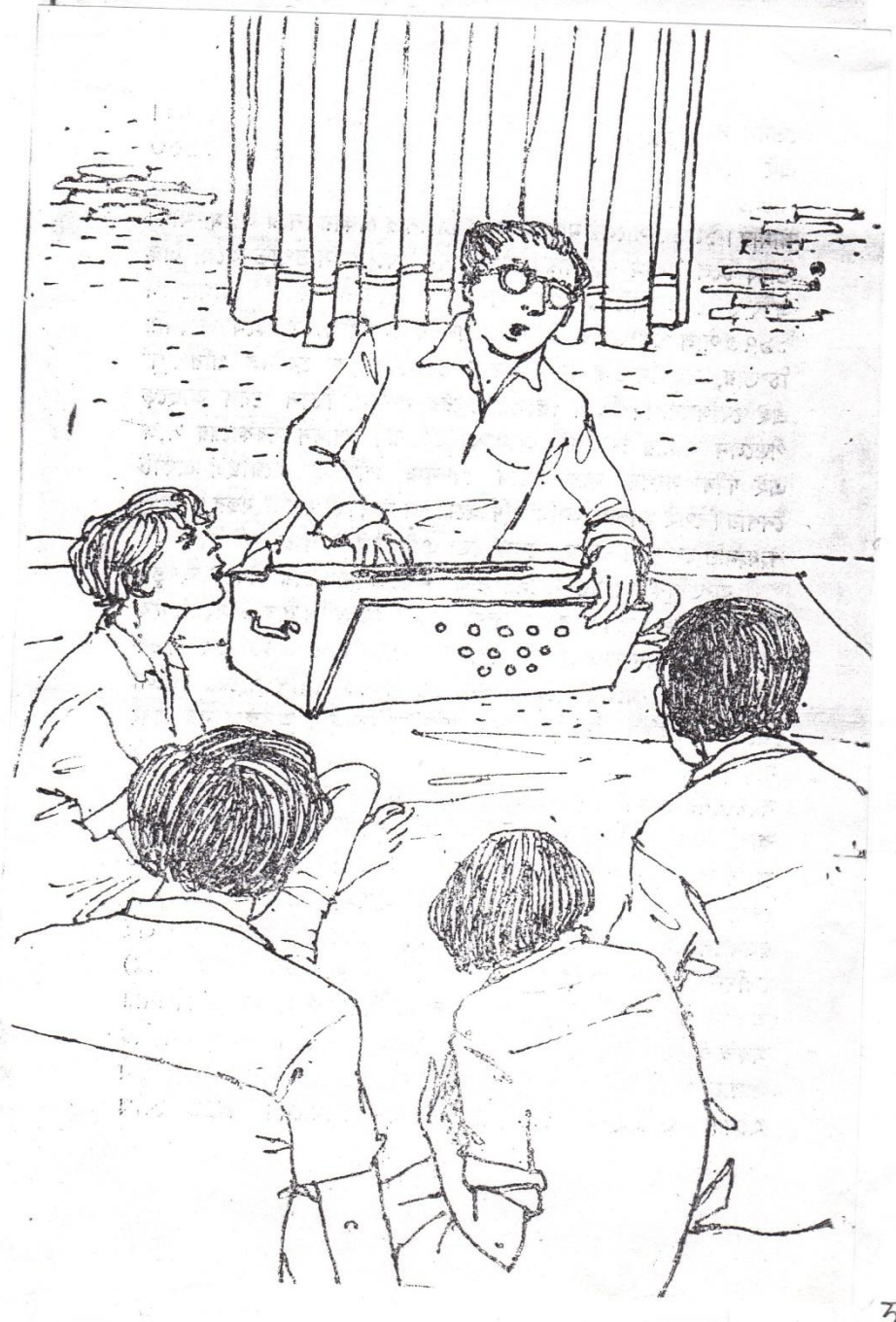

সমাপ্ত